DEPARTMENT OF BENGALI

CHOTOGLOPO

SEM – VI(HONS),DSE-3

DR. SWAPNA DAS

RABINDRANATHER CHOTOGLOPE NARI

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যুর ৭৭ বছর পরেও সমানভাবে সকলের কাছে স্মরণীয় এই তিনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান– সাহিত্যের কোন শাখায় তার বিচরণ নেই? প্রত্যেকটি শাখাতে তিনি তার নিজস্ব ছাপ রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে কিছু বলতে গেলে শেষ হবে না। এখানে তাই তার লেখনীর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী। বিশ্বকবি নারীদেরকে কীভাবে উপস্থাপন করতেন, কেমন ছিল তার সময়কার বাঙালি নারীদের অবস্থা?তার ছোট গল্পের নারীরা ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল। যদিও তিনি তার কবিতা, উপন্যাস এবং গানেও নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারপরও ছোট গল্পে নারীদেরকে তিনি একটু বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটা চোখে পড়ার মতো। সুবেদীতা সেখানের প্রত্যেকটি নারীর ভেতরকার সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের নারীরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত যেকোনো অন্যায়ের শিকার হবে। কোনোভাবেই সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ তারা করতে পারে না। মুখ বুঝে সহ্য করে নেয় সব।যেকোনো সামাজিক রীতিনীতি তাদের মেনে নিতে হয়, সেখানে তাদের নিজস্ব পছন্দ থাকুক বা না থাকুক। যা কিছু নিষিদ্ধ সেগুলো যদি তাদের ভাগ্যে এসে পড়ে সেটা তারা খুব শান্তভাবে মেনে নেয়। সমাজের কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক রীতিনীতিকে হাসিমুখে বরণ করে। যত কষ্টই হোক না কেন, তাদের মনের কষ্ট মনেই লুকিয়ে রাখে, প্রকাশ করে না।এখানে রবীন্দ্রনাথের মুন্সিয়ানা হচ্ছে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান যে কতটা শোচনীয় ছিল সেটা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার ছোটগল্পে। তৎকালীন নববধূর প্রতি সেসময়কার সমাজের কেমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কেমন ধরনের আচরণ বিদ্যমান ছিল সেটাও সুন্দরভাবে ফুঁটে উঠেছে তার ছোট গল্পগুলোতে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলেই সেটি বোঝা যাবে।

রবীন্দ্র নারীর মধ্যে প্রথমেই যার নাম আসে সে হচ্ছে 'হৈমন্তী'। একজন রূপবতী ও গুণী তরুণীর নববধূ হয়ে আসার গল্প। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির মানুষের অবহেলায় বিবর্ণ ফুলের মতো ঝরে যায় সে। বাংলা থেকে দূরে পাহাড়ের দেশে নিজের বাবার কাছে মানুষ সে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী হৈমন্তী যখন বিয়ে করে স্বামীর ঘরে যায় তখন থেকেই তার প্রতি একধরনের অবহেলা এবং অমনোযোগিতা প্রকাশ করে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। নববধূ নতুন সংসারে যাওয়ার সময় নিশ্চয় এমনটি আশা করে যায় না। তার স্বামীও এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করে না এবং তার

পক্ষে কথা বলে না।হয়তো সে বুঝেছিল তার স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক ব্যবহার করা হচ্ছে না কিন্তু সেটি নিয়ে সে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। হৈমন্তীও নিরবে সব সহ্য করে গেছে। তাদের বিয়ের সময় যৌতুক নিয়ে কোনো কথা দুই পরিবারের মধ্যে হয়নি। কিন্তু হৈমন্তীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মনে করেছিল বাবার একমাত্র মেয়ে হওয়াতে তাদের ছেলে হয়তো প্রচুর পয়সার মালিক হবে। শ্বশুরের সম্পত্তির ভার তাদের ছেলের হাতে এসেই পড়বে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে বাস্তবতা আদৌ এমনটি নয় তখন থেকে হৈমন্তীর সাথে তাদের এমন ব্যবহার শুরু হয়।হৈমন্তীর স্বামী যে তাকে প্রচুর ভালোবাসতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তখনকার সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষরা নিজেদের পরিবারের বড়দের উপর কোনো কথা বলতে পারতো না, তাদের সেই অধিকারটুকু ছিল না। সামনে গুরুজনরা অন্যায় কিছু করলেও সেটা সঠিক বলে মেনে নেয়া হতো। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দৃঢ়তা সেসময় সমাজের পুরুষদের ছিল না। নিজের স্বামীর থেকেও কোনো সমর্থন না পেয়ে হৈমন্তী অকালেই ঝরে যায়।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি চরিত্র নিরুপমা। যৌতুকের কারণে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে 'দেনাপাওনার' এই নারী চরিত্র। একজন মেয়ে কম বয়সে যখন নতুন বউ হয়ে আসে তখন ছেলের বাড়ির লোকেদের অবহেলা, তিরস্কার, অপমান বারবার রবীন্দ্রগল্পে চলে এসছে। নিরুপমাও একইরকম বলির শিকার। শেষ পর্যন্ত অবহেলা, অমর্যাদার কারণেই তার মৃত্যু হয় কিন্তু সে নিজের সম্মানটুকু ঠিকই বাঁচিয়ে রেখে মৃত্যুর স্বাদ নেয়।অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছনোর পরেও সে তার বাবাকে টাকা দিতে দেয়নি, শ্বশুরবাড়ির প্রতি মাথানত করতে দেয়নি। সে তার বাবাকে বলেছিল যে তার একটা সম্মান আছে, আত্মমর্যাদা আছে। যদি সে টাকা দেয় সেটা হবে লজ্জার কারণ। নিরুপমা এটাও তার বাবাকে বলে যে সে কোনো টাকার থলে নয় যেটাকে সম্মানের নজরে দেখা হবে তখনই যখন তার ভেতর টাকা থাকে, আর টাকা না থাকলে সেই থলের কোনো দাম নেই। রবীন্দ্রনাথের সময় যৌতুক প্রথার কারণে অনেক কিশোরী এবং তরুণীরা আত্মহত্যা করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে সমাজের শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভেতর যৌতুক দাবি করার প্রবণতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

'মধ্যবর্তিনী' আরেকটি ছোট গল্প যেটা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি করা জটিল নারীচরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিবারণ এবং তার দুই সহধর্মিণী হরিসুন্দরী এবং শৈববালা- এই তিনজনকে নিয়ে গল্প এগিয়েছে। নিবারণ ও তার প্রথম স্ত্রী হরসুন্দরী সুখেই ছিল কিন্তু তাদের কোনো সন্তান ছিল না। হরিসুন্দরী অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিল। স্বামীর অক্লান্ত যত্নে সে আরোগ্য লাভ করে। স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সে সিদ্ধান্ত নেয় যে স্বামীকে যেভাবেই হোক আরেকটি বিয়ে দেবে। হরিসুন্দরীর আশা সেই বিবাহ থেকে তার স্বামী পিতৃত্বের সুখ পাবে যেটা তার কাছ থেকে পায়নি।দ্বিতীয় বিয়েতে বিমুখ থাকা সত্ত্বেও শৈববালার সাথে তার বিবাহ হয়। এরপর খুব দ্রুতই শৈববালার প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয় নিবারণের। এমনকি শৈববালার ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজের কর্মস্থল থেকে টাকা চুরি করতেও দ্বিধাবোধ করে না। খুব দ্রুতই তাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসে। শৈববালার প্রতি নিবারণের ভালোবাসা এবং স্নেহ দেখে হরসুন্দরীর ভেতর ঈর্ষার জন্ম নেয়। এমন সময়ও আসে যে পরিবারের রানী হয়ে ওঠে শৈববালা এবং তার দাসীস্বরূপ হয়ে পড়ে হরসুন্দরী। কিন্তু এজন্য কখনও হরসুন্দরী মুখ ফুঁটে প্রতিবাদ করেনি। সে জানতো যে তার জন্যই এমন হয়েছে।হিংসা বা ঈর্ষা থেকে যে ক্ষোভ জন্ম নেয় সেটা অনেক সময় আবেগের সাথে বাইরে বের হয়ে আসে। কিন্তু

হসুন্দরীর ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। সে নিরবে সব সহ্য করে গেছে। এমনকি শৈববালার মৃত্যুর পরও নিবারণ ও হরসুন্দরীর ভেতর আগের সেই ভালোবাসা ফিরে আসেনি। মৃত্যুর পরও তাদের সম্পর্কের মাঝে শৈববালার উপস্থিতি গল্পে টের পাওয়া যায়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বিন্দু আরেকটি চরিত্র যাকে পরিবার এবং সমাজের নিষ্ঠুরতা বাধ্য করেছিল আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে। 'পোস্টমাস্টারের' রতন চরিত্রটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। স্নেহের টানে রতন নামের মেয়েটির হঠাৎ তরুণী থেকে নারী হয়ে ওঠার গল্প এটি। একজন এতিম এবং গরীব মেয়ের প্রতি স্নেহ ভরা হাত বাড়িয়েছিল পোস্টমাস্টার যেটা কিনা রতনের জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। তার কাছে ছিল সেটা স্বপ্নের মতো। যখন পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়লো তখন সেই তরুণী রতন যেন হয়ে উঠল এক পরিপূর্ণ নারী। মাতৃত্ববোধ তার ভেতরে জেগে উঠল। একজন পরিপূর্ণ নারীর মতো স্নেহ ভরা মনে পোস্টমাস্টারের সেবা করেছিল এই রতন। রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি এই চরিত্রটি।

'বিচারক'-এর ক্ষীরোদা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এক অন্যরকম গল্প। অন্যান্য গল্পে তিনি সমাজে নতুন বউ যৌতুকের কারণে, কিংবা সমাজের রীতিনীতির কারণে যেসব সমস্যার ভেতর দিয়ে যায় সেগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বিচারক' গল্পে তিনি বিধবা বিবাহ নিয়ে কথা বলেছেন। তখনকার সমাজে বিধবা বিবাহকেও যে ভালো চোখে দেখা হতো না সেটা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ক্ষীরোদা চরিত্র দিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ নিয়ে সামাজিক যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন সেই পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের সময়ও খুব বেশি প্রকাশ পায়নি। ১৯৫৫ সালের দিকে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ আইন করা হয় এবং সেসময় থেকেই মূলত হিন্দু সমাজে এই বিবাহ মেনে নেয়া শুরু হয়।

সমাজে নারীদের অসহায় আত্মসমর্পণ নিয়ে গল্প রচনা করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ 'মণিহারা' গল্পে মনি মালিকাকে সৃষ্টি করেন। এই মনি মালিকা ছিল নিজেই একজন আবেগহীন নারী। স্বামীকে যন্ত্রের ন্যায় মনে করতো সে। তার ভালবাসার পুরোটা জুড়েই ছিল শাড়ি আর গহনা। খালি সুগন্ধির বোতল এবং সাবানের বাক্স জোগাড় করতো সে। যখন তার স্বামী নিজের ব্যবসা বাঁচানোর জন্য কিনে দেয়া গহনাগুলো কিছুদিনের জন্য চেয়েছিল তখন মনি মালিকা তাকে সেগুলো দেয়নি বরং সে তার বাবার বাড়িতে ফিরে যেতে চায়। ফিরে যাবার সময় সে তার সকল গহনা পরে রওনা দেয়। কিন্তু পথ মধ্যে তার এক বিশ্বস্ত দাদার হাত থেকে গহনাগুলো বাঁচানোর জন্য সে জলে ঝাপ দেয়। মনি মালিকা তার জীবন দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজের সর্বপ্রিয় গহনা নিজের হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নারীপ্রধান গল্পে সবসময় সমাজে নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা যায় এই দিক থেকে তিনি সফল। কারণ আসলেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমাজে নারীদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। এমনকি ইংরেজভূমেও নারীদেরকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হতো না। সেখানেও তাদেরকে অবহেলার

চোখেই দেখা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সেখানে নারীদের অবস্থা অল্প অল্প করে পরিবর্তিত হয়।বাংলাতেও নারীরা ছিল তুচ্ছ এক প্রাণী। সেসময় বেশিরভাগ নারীর যে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না সেটাও রবীন্দ্র গল্পে ফুটে ওঠে। এছাড়া যে হবু স্বামীর প্রতি কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার মধ্য দিয়ে একটি মেয়ে সব কিছু ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়িতে সংসার করতে যায়, সে স্বামীদেরও যে তাদের জন্য কিছুই করার থাকত না সেটাও রবীন্দ্রনাথ বারবার বুঝিয়েছেন। মেরুদণ্ডহীন পুরুষদের মতো আচরণ ছিল তাদের। এটাও নারীদের অবহেলার একটি দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্র ছোট গল্পে নারীর স্বরূপ যেন বাস্তবেরই দর্পন।

তথ্যসূত্র:বাংলা পিডিয়া